

খোলাসাতুল কোরআন

(পবিত্র কোরআনের মর্মকথা)

গ্রন্থনা

মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মাসরুর

মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

নাশাত

পারা-সূচি

দ্বিতীয় পারা : ৩৩
তৃতীয় পারা : ৪৩
চতুর্থ পারা : ৫৬
পঞ্চম পারা : ৬৪
ষষ্ঠ পারা : ৭৩
সপ্তম পারা : ৮৩
অষ্টম পারা : ৯০
নবম পারা : ৯৯
দশম পারা : ১০৮
এগারোতম পারা : ১১৬
বারোতম পারা : ১২৫
তেরোতম পারা : ১৩২
চৌদ্দতম পারা : ১৪০
পনেরোতম পারা : ১৪৮
ষোলোতম পারা : ১৫৮
সতরোতম পারা : ১৬৮
আঠারোতম পারা : ১৭৮
উনিশতম পারা : ১৮৮
বিশতম পারা : ১৯৭
একুশতম পারা : ২০৪
বাইশতম পারা : ২১৫
তেইশতম পারা : ২২৫
চব্বিশতম পারা : ২৩৪
পঁচিশতম পারা : ২৪২
ছাব্বিশতম পারা : ২৫০
সাতাইশতম পারা : ২৬২
আঠাশতম পারা : ২৭৪
উনত্রিশতম পারা : ২৯১
ত্রিশতম পারা : ৩০৫

সূরা-সূচি

সূরা ফাতিহা :	২৫
সূরা বাকারা :	২৬
সূরা আলে ইমরান :	৪৮
সূরা নিসা :	৬১
সূরা মায়েদা :	৭৪
সূরা আনআম :	৮৬
সূরা আরাফ :	৯৩
সূরা আনফাল :	১০৫
সূরা তাওবা :	১১২
সূরা ইউনুস :	১২০
সূরা হুদ :	১২৫
সূরা ইউসুফ :	১২৯
সূরা রাদ :	১৩৫
সূরা ইবরাহিম :	১৩৮
সূরা হিজর :	১৪০
সূরা নাহল :	১৪৪
সূরা ইসরা :	১৪৮
সূরা কাহাফ :	১৫২
সূরা মারয়াম :	১৬০
সূরা ত-হা :	১৬৪
সূরা আমবিয়া :	১৬৮
সূরা হজ্জ :	১৭৪
সূরা মুমিনুন :	১৭৮
সূরা নূর :	১৮১
সূরা ফুরকান :	১৮৮
সূরা শুআরা :	১৯০
সূরা নামল :	১৯৪
সূরা কাসাস :	১৯৮
সূরা আনকাবুত :	২০৩
সূরা রুম :	২০৬

সূরা লোকমান :	২০৮
সূরা সাজদা :	২১০
সূরা আহজাব :	২১২
সূরা সাবা :	২২০
সূরা ফাতির :	২২২
সূরা ইয়াসিন :	২২৪
সূরা সাফফাত :	২২৭
সূরা স-দ :	২৩০
সূরা যুমার :	২৩২
সূরা গাফির :	২৩৫
সূরা হা-মীম সাজদা :	২৩৯
সূরা শুরা :	২৪৩
সূরা যুখরুফ :	২৪৫
সূরা দুখান :	২৪৭
সূরা জাসিয়া :	২৪৮
সূরা আহকাফ :	২৫০
সূরা মুহাম্মদ :	২৫১
সূরা ফাতাহ :	২৫৩
সূরা হুজুরাত :	২৫৬
সূরা কাফ :	২৫৯
সূরা জারিয়াত :	২৬০
সূরা তুর :	২৬২
সূরা নাজম :	২৬৪
সূরা কমার :	২৬৫
সূরা রহমান :	২৬৭
সূরা ওয়াকিয়া :	২৭০
সূরা হাদিদ :	২৭২
সূরা মুজাদালা :	২৭৪
সূরা হাশর :	২৭৬
সূরা মুমতাহিনা :	২৭৮
সূরা সফ :	২৮১
সূরা জুমআ :	২৮২
সূরা মুনাফিকুন :	২৮৪
সূরা তাগাবুন :	২৮৬
সূরা তালাক :	২৮৭

খোলাসাতুল কোরআন

- সূরা তাহরিম : ২৮৯
সূরা মুলক : ২৯১
সূরা কলম : ২৯২
সূরা হাক্কাহ : ২৯৪
সূরা মাআরিজ : ২৯৫
সূরা নুহ : ২৯৬
সূরা জিন : ২৯৭
সূরা মুযাশ্শিল : ২৯৮
সূরা মুদ্দাসসির : ২৯৯
সূরা কিয়ামাহ : ৩০০
সূরা দাহার : ৩০২
সূরা মুরসালাত : ৩০৩
সূরা নাবা : ৩০৫
সূরা নাজিয়াত : ৩০৬
সূরা আবাসা : ৩০৭
সূরা তাকবির : ৩০৮
সূরা ইনফিতার : ৩০৮
সূরা মুতাফফিফিন : ৩০৯
সূরা ইনশিকাক : ৩১০
সূরা বুরুজ : ৩১০
সূরা তারিক : ৩১১
সূরা আ'লা : ৩১২
সূরা ফজর : ৩১২
সূরা গাশিয়া : ৩১৩
সূরা বালাদ : ৩১৪
সূরা লাইল : ৩১৪
সূরা শামস : ৩১৫
সূরা দোহা : ৩১৫
সূরা ইনশিরাহ : ৩১৬
সূরা তিন : ৩১৭
সূরা আলাক : ৩১৭
সূরা কদর : ৩১৮
সূরা বাইয়িনা : ৩১৮
সূরা যিলযাল : ৩১৯
সূরা আদিয়াত : ৩১৯

সূরা কারিয়া :	৩২০
সূরা তাকাসুর :	৩২০
সূরা আসর :	৩২০
সূরা হুমাজা :	৩২১
সূরা ফিল :	৩২১
সূরা কুরাইশ :	৩২১
সূরা মাউন :	৩২২
সূরা কাউসার :	৩২২
সূরা কাফিরুন :	৩২৩
সূরা নাসর :	৩২৩
সূরা লাহাব :	৩২৩
সূরা ইখলাস :	৩২৪
সূরা ফালাক :	৩২৪
সূরা নাস :	৩২৫

হিজরি চোদ্দতম শতাব্দীর প্রখ্যাত ও বরেণ্য বুজুর্গ, বিশিষ্ট আলেমেদীন, ওয়াইসে যামান^১ মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ. এর ব্যাপারে মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন রহ. লিখেছেন, ‘মাওলানা ফজলুর রহমান একদিন বিভোর ও বিমোহিত হয়ে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনি আমাকে (মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইনকে) বলেছিলেন, কোরআন থেকে আমরা যে স্বাদ পাই তোমরা যদি তার সামান্যও পেতে, তা হলে কাপড়চোপড় ছিড়ে জঙ্গলে চলে যেতো’ তারপর অবচেতনভাবে তার বুক চিরে একটি ‘আহ’ শব্দ বেরিয়ে আসে এবং তিনি কামরায় চলে যান। এরপর কয়েকদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলি রহ. বলেন, আমি একদিন মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবকে বলেছিলাম, কবিতায় আমি যে আনন্দ পাই কোরআনে তা পাই না। তিনি বললেন, এখনো দূরত্ব রয়ে গেছে। কোরআনের সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলে যে আনন্দ পাওয়া যাবে, অন্য কিছুতে তা পাওয়া যাবে না।

মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন রহ. আরো লিখেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন, ‘বেশি বেশি কোরআন ও হাদিস পাঠ করবে, আল্লাহ তোমার অন্তরে চলে আসবেন।’

একদিন তিনি বললেন, আমাদেরকে যদি কোরআনুল কারিমের পরিবর্তে জ্ঞানাত দেওয়া হয়, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হবো না। আমাদেরকে কোরআন দেওয়া হবে। হুরেরা আমাদের কাছে এলে বলব, ‘এসো এসো প্রিয়তমা! কাছে বসো! তুমিও কোরআন শোনো।’

পবিত্র কিতাবের এই সত্যিকার প্রেমিক, মাওলানা ফজলুর রহমানের নামেই অধম কোরআনুল কারিমের এ সামান্য খেদমত অর্পণ করছি। প্রার্থনা করি, রাব্বের কারিম যেন অধমকেও এই প্রেমের কিছু অংশ দান করেন।

দোয়াপ্রার্থী

মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী

^১ اویس শব্দটি আরবি اویس শব্দের তাসগির, যার অর্থ : দান, উপহার ইত্যাদি। তাই ‘ওয়াইসে যামানা’-এর শাব্দিক অর্থ হয় জমানার উপহার।

ভূমিকা

لا يمكن إحصاء نِعَم الله تعالى على هذا العبد الضعيف، وأجلها التوفيق على فهم القرآن العظيم، ومِنَ ملجأ الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم على أحقر الأمة كثرةً جدًّا، وأعظمها تبليغ (وتعليم) الفرقان العظيم. فإن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لَقَّن القرآن المجيد على القرن الأول (الصحابة) وهم بَلَّغوه إلى القرن الثاني (التابعين)، وهكذا بَلَّغ القرن الثاني إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، حتى وصل إلى هذا العبد العاجز المحتاج حظًّا من رواية القرآن الحكيم ودرايته. اللهم صل على هذا النبي الكريم، سيدنا ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك وأيمن بركاتك، وعلى أله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.^১

এ অসহায় বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর নেয়ামত অসংখ্য-অগুনতি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে কোরআনুল কারিম বোঝার তাওফিক।

উম্মাহর এ নগণ্য সদস্যের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহও অনেক। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, কোরআনুল কারিমের দাওয়াত (ও শিক্ষা) পৌঁছে দেওয়া। প্রথম যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারা শিক্ষা দিয়েছেন দ্বিতীয় যুগের লোকদের (তাবেয়ীদের)। এভাবে দ্বিতীয় যুগের লোকেরা তৃতীয় যুগের লোকদের, আর তৃতীয় যুগের লোকেরা চতুর্থ যুগের লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন। অব্যাহতধারায় এ অধমের নিকটও কোরআনের বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যা এসে পৌঁছেছে।

^১ খুতবাটি উল্লেখ করা হয়েছে ‘আল-ফাউয়ল কাবির’ গ্রন্থের আরবিসংস্করণ থেকে। এটির আরবি ভাষান্তর করেছেন জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান-এর বিশিষ্ট উসতায় মুহাম্মদ আনওয়ার বাদাখশানি। বস্তুত এটিই এই কিতাবের প্রথম আরবি সংস্করণ নয়। মূল গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় হওয়াতে ইলমি-মহলে গ্রন্থটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার বিচারে এর আগেও আলেমগণ এটিকে আরবিপাঠে রূপ দিয়েছেন। হ্যাঁ, খুতবাটির মূল যেহেতু ফারসি ভাষায় ছিল, তাই পরবর্তীতে যারা এটিকে আরবিতে ভাষান্তর করেছেন, তারা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিতাবের মূল ফারসি নুসখার ভিন্নতার দরুন একেকজনের আরবি ভাষান্তরেও ভিন্নতা এসেছে। রাব্বুল আল-মীন সকলকে উত্তম জাযা দান করুন।

খোলাসাতুল কোরআন

হে আল্লাহ, আমাদের সরদার, অভিভাবক ও শাফাআতকারী এ মহান নবীর উপর আপনার সর্বোত্তম রহমত এবং সর্বোচ্চ বরকত নাজিল করুন।
হে পরম দয়াময়, তার পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মতের ওলামায়ে কেরাম সকলের উপর আপনার রহমত নাজিল করুন।

এটি একটি মোবারক খুতবা, যার দ্বারা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. কোরআনের মূলনীতি বিষয়ে রচিত প্রসিদ্ধ কিতাব ‘আল-ফাউয়ুল কাবিরে’র সূচনা করেছেন। তবে এ খুতবায় উল্লেখকৃত ‘কোরআন বোঝা’র স্থলে ‘কোরআনের মহব্বত’ বললে কথাটি অধর্মের আগ্রহের পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করবে।

অধম কোরআন বোঝার দাবি করতে না পারলেও কোরআনের মহব্বতের দাবি অবশ্যই করতে পারি। আর এ মহব্বতের কারণেই অধর্মের আকাঙ্ক্ষা, যে মহান সত্তা অসম্ভবকে সম্ভব করেন এবং অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনেন, হয়, তিনি যদি কোরআনের তেলাওয়াত, খেদমত, পাঠন-পাঠন ও তার প্রচার-প্রসারকে আমার ও আমার সন্তানদের শয়ন-স্বপনের সঙ্গী বানিয়ে দিতেন! যদি আমার কলম-জবান, দিল-দেমাগ ও অস্তিত্ব সর্বদা কোরআনের নুর ও তার ফয়েজ দ্বারা আলোকোজ্জ্বল থাকত!

বারবার ইচ্ছা জাগে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জীবন্ত মুজিজার ছায়াতলেই যেন কেটে যায় জীবন। কোরআনের শব্দ জপতে জপতেই যেন আসে মৃত্যুর ডাক।

পবিত্র কিতাবের সাথে এমন একটি সম্পর্কের স্বপ্ন থেকেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

১৪২৪ হিজরির রমজানুল মোবারকে দৈনিক ‘ইসলাম’ কর্তৃপক্ষ ‘রমজান স্পেশাল’ নামে একটি পাতা প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করে। এ পাতায় অন্যান্য শিরোনামের পাশাপাশি ‘খোলাসাতুল কোরআন’ নামটিও রাখা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে প্রতিদিন এক পারার সারসংক্ষেপ তৈরি করার অনুরোধ জানানো হয়। আমি আমার হৃদয়ের স্বপ্ন ও জীবনের সৌভাগ্য মনে করে কাজটি গ্রহণ করি।

উদ্দেশ্য ছিল, মুসল্লিগণ তারাবিতে যে পারাটি শুনবেন, সকালে যেন তার আলোচ্য বিষয়ের নির্বাচিত অংশ অধ্যয়ন করে নিতে পারেন। এর ফলে কিছুটা হলেও মানুষ কোরআনুল কারিম বোঝার সৌভাগ্য লাভ করবে।

বিষয়টি সাধারণ মানুষের জন্য শুরু করা হলেও পরে বিশেষ ব্যক্তিদের নিকটও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ফটোকপি করে বিভিন্ন মসজিদে বিলিও করা হয়। অনেক হাফেজ ও ইমাম পরবর্তী বছরের জন্য সময়ে তা সংরক্ষণও করেন। এরই সাথে বিভিন্ন মহল থেকে লেখাগুলো গ্রন্থবদ্ধ

করার প্রস্তাবও আসতে থাকে। অধর্মের নিকট বিষয়টি ভালোই মনে হয়। কেননা কয়েক বছর যাবৎ রমজানুল মোবারকে দৈনিক কোরআনের সারমর্ম শোনানোর একটি বরকতময় ধারা চলে আসছিল।

এরই সাথে আরেকটি তিক্ত বাস্তবতাও লেখাগুলোকে বইয়ে রূপ দেওয়ার চাহিদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তা এই যে, বিগত কয়েক বছর থেকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বহু মানুষ নিজ-নিজ বুঝ অনুযায়ী কোরআনের সারমর্ম আবিষ্কারের দুঃসাহস দেখাতে শুরু করেছিল। বরং সন্দান চালিয়ে দেখা গেছে, এক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষই এমন, যারা কোনো দীনি প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষজ্ঞদের কাছে রীতিমতো শিক্ষা অর্জন করেননি। এমতাবস্থায় যদি তারা এভাবে লাগামহীন মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে থাকে, বা মনগড়া তাফসির করতে থাকে, তবে তা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডেকে আনবে বেশি।

এজন্য এমন একটি কিতাবের প্রয়োজন ছিল, যাতে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসিরের সাহায্যে কোরআনের সারমর্ম উল্লেখ করা হবে এবং যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারবে। আর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ রমজান মাসে তা মুসল্লিদের সামনে পরিবেশন করতে পারবেন।

আলহামদু লিল্লাহ, দয়াময় আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শোকর যে, আমার মতো একজন দুর্বল ও অক্ষম বান্দাকে সময়ের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি তিনি পূরণ করার তাওফিক দান করেছেন।

সারমর্ম প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে আল্লামা ওয়াহবা যুহাইলি রহ. এর التفسير المنير এবং কোরআন-সুন্নাহর খাদেম শায়েখ মুহাম্মদ আলি সাবুনির قيس من نور القرآن الكريم থেকে।

রমজান মাসে যেহেতু খুব দ্রুততার সাথে খোলাসাটি তৈরি করা হয়েছিল, তাই পরবর্তীতে গ্রন্থবদ্ধ করতে গিয়ে একই আন্দাজ ও শৈলীতে প্রকাশ করার জন্য প্রথম চার পারার নতুন করে খোলাসা লেখা হয়। বাকি পারাগুলোর উপর পুনঃদৃষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়।

বইটি ত্রুটিমুক্ত করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। তবু কোনো মানুষই ত্রুটিমুক্ত নয়। এটা তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় গুণ। তিনি সকল ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। পাঠকদের নিকট নিবেদন থাকবে, কোনো ধরনের ভুলত্রুটি নজরে পড়লে আমাদের অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া হবে। এতে আমরা খুশি হবো এবং যিনি জানাবেন, তার জন্য দোয়া থাকবে।

পরিশেষে কিছু নিবেদন রাখতে চাচ্ছি। প্রথমত কোরআন মাজিদের প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতিটি আয়াত ও শব্দের পেছনে রয়েছে এক এক জগৎ।

খোলাসাতুল কোরআন

সত্য তো এই যে, কোরআনের কোনো খোলাসা হতে পারে না। খোলাসার নামে আপনাদের সামনে যা পেশ করা হচ্ছে, তা কোরআনের অন্তর্হীন জগতের সামান্য বলকমাত্র। এ যেন মহাসমুদ্রের সামান্য কয়েক ফোটা। ‘যার পুরোটা পাওয়া যাবে না তার সবটাই ছাড়া যাবে না’ এই নীতির আলোকে এই সামান্য বলকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেন কেউ পুরো কোরআন অধ্যয়ন করতে না পারলেও কমপক্ষে এক নজরে তার বিষয়সমূহ দেখে নিতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, হতে পারে আল্লাহ তায়ালা সংক্ষিপ্ত অধ্যয়নের বরকতে বিস্তারিত অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করে দেবেন।

দ্বিতীয় নিবেদন হল, আমাদের এখানে যেহেতু তারাবিতে পারা অনুযায়ী তেলাওয়াত করা হয়, তাই পারা হিসাবেই সারমর্ম তৈরি করা হয়েছে। অন্যথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সুরা হিসেবেই কোরআনকে ভাগ করেছেন। পারা, অর্ধেকাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি ভিত্তিতে ভাগ করার বিষয়টি পরবর্তীতে চালু হয়েছে।

যখন কোনো নতুন আয়াত নাজিল হতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বিভিন্ন সুরায় রাখতে বলতেন। কোনো পারায় রাখার হুকুম দিতেন না। বলাবাহুল্য, বিষয়ের সাথে মিল থাকার কারণেই তিনি বিভিন্ন সুরায় তা রাখার নির্দেশ দিতেন। যদি কোনো সুরার সাথে বিশেষ মিল না-পাওয়া যেত তা হলে সে আয়াতকে যেকোনো সুরার সাথে যুক্ত করার সুযোগ প্রদান করতেন। এই কারণেই ১১৪ সুরায় এতটা তফাত। এক সুরা মাত্র তিন আয়াতবিশিষ্ট; অপর সুরা ২৮৬ আয়াতবিশিষ্ট।

কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোলাসা উল্লেখ করতে গিয়ে সুরার প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যিক। কিন্তু তারাবিতে যেহেতু পারা হিসেবে তেলাওয়াত করা হয় এজন্য খোলাসা তৈরি করতে গিয়ে সুরা ও পারা উভয়টির প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। প্রত্যেক পারার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করে সাথে আয়াত নম্বর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগ্রহী পাঠকবৃন্দ তাফসিরের কিতাবাদি থেকে তা বিস্তারিত অধ্যয়ন করে নিতে পারবেন।

শেষনিবেদন হচ্ছে, কোরআন মাজিদ এমন মহাকিতাব, মহব্বতের দৃষ্টিতে যা দেখা এবং আদব-ইহতিরামের সাথে যা স্পর্শ করা—কোনোকিছুই অনর্থক নয়। কিন্তু এই অথৈ সাগর বা সদা ছায়াদার বৃক্ষ থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত অন্তরে এই কিতাবের মহত্ত্ব বিদ্যমান থাকতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, কোরআন এক মহান কিতাব, যার মহত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বহুবার শপথ করেছেন।

শুধু সুরা ওয়াকিয়ার প্রতি লক্ষ করুন; তাতে বলা হয়েছে, ‘অতএব, আমি তারকারাজির অস্ত্রাচলের শপথ করছি, আর অবশ্যই এ এক মহা শপথ, যদি

তোমরা জানতে! নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা আছে এক সুপ্ত কিতাবে। যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না। এটা বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবু কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে?’

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বুঝে-শুনে এ কিতাব তেলাওয়াত করা উচিত। অন্তরের পরিশুদ্ধি, চারিত্রিক পবিত্রতা, জীবনের মোড় পরিবর্তন এবং বরকত অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোরআন অনুধাবন এবং তা বুঝে তেলাওয়াতের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। অন্তরে অনুধাবনের পর নিজে নিজে তা বুঝে তেলাওয়াত করা এবং অন্যদের কাছেও এই নেয়ামত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা।

এ বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত যে, গোটা বিশ্বের ভবিষ্যৎ হচ্ছে কোরআন। দুশ্চিন্তা, মনোরোগ, রাজনৈতিক বিরোধ, পারস্পরিক মতভিন্নতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, জীবিকার কষ্ট প্রভৃতি সমস্যায় যারা জর্জরিত, একদিন না একদিন তাদের বিশ্বাস করতেই হবে যে, তাদের সব সমস্যার সমাধান একমাত্র কোরআন। কোরআনই মানসিক প্রশান্তির একমাত্র পাথর।

চলুন, দুনিয়ার পিপাসার্ত মানুষকে কোরআনের নির্মল ঝরনাধারার দিকে পথ প্রদর্শন করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি। আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের নিকট এই খোলাসাতুল কোরআন—যা মূলত সামান্য প্রচেষ্টামাত্র, পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করি।

ইনশাআল্লাহ, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে।

দোয়াপ্রার্থী

মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী

সুরা ফাতিহা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭। রুকুসংখ্যা : ১

প্রথম পারায় সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার কিছু অংশ স্থান পেয়েছে। সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, সুরা ফাতিহা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়া^১ তারা এ ব্যাপারেও একমত পোষণ করেছেন যে, এ সুরা মক্কি জমানার প্রথমদিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা ফাতিহা ছোট হলেও সংক্ষেপে এতে গোটা কোরআনের মৌলিক উদ্দেশ্য উঠে এসেছে। এ কারণেই একে ‘উম্মুল কোরআন’ ও ‘আসাসুল কোরআন’ও বলা হয়। অর্থাৎ সুরা ফাতিহা গোটা কোরআনের মৌলিক বিষয়াদির ভূমিকা ও তার সারনির্ধাস^২ আর তা এভাবে যে, কোরআনের মৌলিক বিষয় তিনটি; তাওহিদ, রিসালাত ও কেয়ামত। সুরা ফাতিহার প্রথম দুই আয়াত ও চতুর্থ আয়াতে তাওহিদের আলোচনা করা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে আলোচনা এসেছে কেয়ামত সম্পর্কে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ আয়াতে নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পাশাপাশি এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা নাম ও গুণাবলি, তার ইবাদত, তার কাছে সাহায্যপ্রার্থনা, তার পথে অবিচলতা এবং তার কাছেই হেদায়েত চাওয়ার বিধানও উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে নবী ও নেককারদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে সেসব সম্প্রদায়ের ভ্রষ্ট পথ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা নিজেদের জ্ঞান ও আদর্শগত ভ্রান্তির কারণে আল্লাহ তায়ালা গজব ও আজাবের উপযুক্ত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, সুরা ফাতিহা হচ্ছে এক অতুলনীয় দোয়া, মারেফাতের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং কোরআনি ইলম ও জ্ঞানের স্বচ্ছ আয়না, যাতে অবশিষ্ট ১১৩টি সুরার ঝলক পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত বারবার এ ঝলক পরিলক্ষ করার জন্যই নামাজে প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

^১ প্রকৃতপক্ষে সুরা ফাতিহা মক্কি না মাদানি (মক্কায়া নাকি মদিনায় অবতীর্ণ) এ ব্যাপারে তাফসিরকারদের দুটি মত আগে থেকেই রয়েছে। তবে অধিকাংশই মক্কি হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাফসিরে তাবারি, মিসর দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত, (১/১১১); তাফসিরে কবির, বৈরুত দারুল-ইহয়াইত তুরাস আল-আরাবি হতে প্রকাশিত, (১/১৫৯); তাফসিরে কুরতুবি, মিসর দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত, (১/১১৬), তাফসিরে ইবনে কাসির, দারে তাইবা হতে প্রকাশিত, (১/১০১), রুহুল মাআনি, বৈরুত দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া হতে প্রকাশিত, (১/৩৫)

^২ তাফসিরে কুরতুবি, মিসর দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত, ১/১১২

সুরা বাকারা

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৮৬। রুকুসংখ্যা : ৪০

সুরা বাকারা কোরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সুরা। এ সুরার অধিকাংশ আয়াতই মদিনায় হিজরতের পর প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

আরবি বাকারা শব্দের অর্থ গাভী। যেহেতু এ সুরায় বাকারা শব্দটি এসেছে এবং এতে গাভী জবাই করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে; তাই একে সুরাতুল বাকারা বলে নামকরণ করা হয়েছে।

ঘটনা হল, বনি ইসরাইলে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। কিন্তু এক দরিদ্র ভাতিজা ছাড়া তার কোনো ওয়ারিশ ছিল না। সেই ভাতিজা সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে। এরপর রাতের অন্ধকারে তার লাশ অন্যের দরজার সামনে ফেলে রেখে ঘরের মালিককে খুনি বলে অভিযুক্ত করে। তারপর দুইপক্ষের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে বাদী-বিবাদীর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।

এরই মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তৎকালীন নবী হজরত মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে একটি গাভী জবাই করে তার গোশতের কিছু অংশ মৃত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করার নির্দেশ দেন। যার ফলে সে জীবিত হয়ে ওঠে এবং হত্যাকারীর নাম বলে দেয়া^১ ঘটনাক্রমে বাদী-বিবাদীদের একপক্ষ মৃত্যু-পরবর্তী জীবন অস্বীকার করত। নিহত ব্যক্তির এই পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে শুধু হত্যাকারীর নামই জানা গেল না; বরং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ব্যাপারেও এটি চাম্ফুষ দলিল হয়ে রইল। এ ছাড়াও মিসরিদের সাথে দীর্ঘকাল ওঠাবসা করায়^২ বনি ইসরাইলের মনে গাভীর প্রতি এক ধরনের বিশ্বাস ও ভালোবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। গাভী জবাইয়ের বিধান দিয়ে তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের এই ভালোবাসাকে ভেঁসনা করা হয়েছে।^৩

এ ছাড়া প্রথম পারায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

^১ বিস্তারিত : তাফসিরে তাবারি : ২/৭৬; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৯৪। তবে মিশকাতুল মাসাবিহ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী হত্যাকাণ্ডের কারণ ছিল বিবাহজনিত। মিরকাতুল মাফাতিহ, দারুল ফিকর বৈরুত হতে প্রকাশিত : ৫/২০৪৫

^২ কারো কারো মতে সামেরি কর্তৃক গাভীকে ইলাহ ঘোষণার পর গাভীর প্রতি তাদের যে বিশ্বাস ও ভালোবাসা জন্মেছিল- উল্লেখিত ঘটনার মাধ্যমে তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। (রুহুল মাআনি : ১/২৯২)

^৩ রুহুল মাআনি : ১/২৯২

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থায়ী মুজিজা কোরআনুল কারিমের মাধ্যমে এ সুরার সূচনা হয়েছে। এটা তো আমরা সকলেই জানি যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বস্তুগত ও অবস্তুগত বহু মুজিজা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু তার সবচেয়ে বড় মুজিজা হচ্ছে ইলম তথা জ্ঞান।

এ সুরার সূচনা হয়েছে আলিফ-লাম-মিম তথা হরফে মুকাত্তয়াত দ্বারা। সূচনার এই রীতি আরবদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। এর ফলে বাধ্য হয়ে তারা কোরআনের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং তার আলোচনা শোনা শুরু করে। হরফে মুকাত্তয়াত দ্বারা যে সকল সুরার সূচনা হয়েছে, সেখানে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার সত্যতারও আলোচনা এসেছে।^১ এই কারণে এক দল আলেমের মতে, এসব হরফের মাধ্যমে কোরআন মানবরচিত হওয়ার দাবিদারদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআন যদি আসলেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানানো কথা হতো, তা হলে তোমরা সকাল-সন্ধ্যা যে ভাষায় কথা বলো, তার মাধ্যমেই এমন কোরআন নিয়ে এসো দেখি! ভাষা-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার কারণে তো তোমরা গর্ব করে থাকো,^২ যে কারণে তোমরা সকল অনারবকেই আজম (বোবা)^৩ আখ্যায়িত করে থাকো!

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, না অতীতের কোনো কাফের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পেরেছে আর না আজকের কোনো কাফের। এবং কেয়ামত পর্যন্ত কেউ-ই এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে না।

বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষ তিন প্রকার

বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষ তিন প্রকার। মুমিন, কাফের ও মুনাফিক। মুমিনের পাঁচটি গুণ রয়েছে।

১. ঈমান বিল গাইব। অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সকল বিষয় অনুভব করা যায় না, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন : জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর, হিসাবনিকাশ ইত্যাদি।
২. ইকামাতে সালাত। অর্থাৎ সকল শর্ত এবং আদবের প্রতি লক্ষ রেখে নামাজ আদায় করা।
৩. জাকাত আদায়। সাধারণত কোরআনে কারিমে নামাজ ও জাকাতের কথা একসাথেই এসেছে। নামাজ হচ্ছে আল্লাহর হুক আর জাকাত বান্দার হুক। মানুষের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা পেতে পারে না যতক্ষণ সে উভয় প্রকার হুক আদায় না করে।

^১ তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৩৬৭

^২ তাফসিরে কুরতুবি : ১/১৫৫

^৩ আরবি আজম শব্দটির অনেকগুলো অর্থ ও ব্যবহারের মাঝে এটি একটি। (আল-কামুসুল মুহিত, ফিরোজাবাদী, পৃষ্ঠা : ১৪৬৬)

খোলাসাতুল কোরআন

৪. পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের উপর যেসকল আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে, তার উপর ঈমান আনা।^১

৫. আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা চার আয়াতে মুমিনদের, দুই আয়াতে কাফেরদের এবং তেরো আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করেছেন। এই তেরো আয়াতে মুনাফিকদের বারোটি বদ-অভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মুসলমানদের জন্য এই বদ-অভ্যাস থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা জরুরি।

বদ-অভ্যাসগুলো এই : মিথ্যা, ধোঁকা, অনুভূতিহীনতা, অন্তরের ব্যাধি— (হিংসা, অহংকার, লোভ প্রভৃতি) চক্রান্ত, প্রতারণা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা, পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমানতা, মুমিনদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ।^২

আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা

এ পারার বা এ সুরার আরেকটি বিষয় হল, হজরত আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহাস সালামের ঘটনা,^৩ যা ঘটেছিল অভিশপ্ত ইবলিসের সাথে। প্রকৃতপক্ষে এটা পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত এবং গোটা মানব-সভ্যতারই ঘটনা।^৪ এই ঘটনা হক ও বাতিল, কল্যাণ ও অনিষ্টের মধ্যকার চিরস্থায়ী লড়াইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।^৫

^১ সূরা বাকারার ৪নং আয়াতে সূক্ষ্মভাবে খতমে নবুওয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এমন কোনো ব্যক্তির আগমন হবে না, যার উপর ওহী অবতীর্ণ হবে, যিনি নবী বা রাসুল হবেন। আয়াতে কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহী ও তার পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের নিকট অবতীর্ণ ওহীর উপর ঈমান আনতে নির্দেশ করা হয়েছে। তার পরবর্তী কোনো ওহীর কথা বলা হয়নি। যদি তারপরেও কারো প্রতি ওহী আসত, যার ওহীর উপর ঈমান আনা আবশ্যিক হতো, তা হলে আয়াতে তাও উল্লেখ হতো। যেমন পূর্ববর্তী নবীদের থেকে শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। -আলে ইমরান, আয়াত ৮১

^২ বিস্তারিত : তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/১৯২

^৩ অর্থাৎ শয়তানের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করা, এরপর আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা, যা ৩৫নং আয়াত থেকে আলোচিত হয়েছে।

^৪ কারণ শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আদম আলাইহিস সালামের ভুল বা ইজতিহাদি বিচ্যুতির ফলে রাব্বুল আলামিন তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মানবজাতির আবাদ ও বসবাস শুরু হয়।

^৫ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশে শয়তানের বিভাতিত ও অভিশপ্ত হওয়ার পর সে আল্লাহর কাছে কেসামত পর্যন্ত মানবজাতিকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার অবকাশ প্রার্থনা করে। আল্লাহ

এই ঘটনার মাধ্যমে হজরত আদম আলাইহিস সালামের মহান ব্যক্তিত্বের কথা জানা যায়। জানা যায়, তাকে পৃথিবীতে খেলাফত প্রদান করা হয়েছিল^১ এবং এমন ইলম দেওয়া হয়েছিল, যা ফেরেশতাদেরও ছিল না। তারপর ফেরেশতাদের আদেশ করা হল, আদমকে সিজদা করো।

খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ায় সকল আদম-সন্তান এই ব্যাপারে আদিষ্ট যে, পৃথিবীতে তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করবে এবং পৃথিবীকে আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী চালাবে।^২

বনি ইসরাইলের আলোচনা

কোরআনুল কারিমের বহু স্থানে বনি ইসরাইলের আলোচনা এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সূরা বাকারায়। বরং প্রথম পারার প্রায় পুরোটা জুড়েই তাদের আলোচনা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম আলোচনা করা হয়েছে যে, বনি ইসরাইলকে জাহেরি-বাতেনি, দীনি ও দুনিয়াবি অসংখ্য নেয়ামত প্রদান করা হয়েছিল।^৩ যেমন : তাদের বংশ থেকে বহু নবী-রাসূল জন্ম লাভ করেছেন। তাদেরকে পার্থিব সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছিল। তাওহিদ ও ঈমানের আকিদার নেয়ামত দেওয়া হয়েছিল। ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

তায়াল্লা তাকে সেই সুযোগ প্রদান করেন। এর মাধ্যমেই কেয়ামত পর্যন্ত হকের বিপরীতে বাতিলের অভ্যুদয় ঘটে। সূরা আ'রাফ-এর ১২ এবং সূরা স-দ-এর ৭৩নং আয়াত থেকে এর বিবরণ আলোচিত হয়েছে।

^১ সূরা বাকারার ৩০নং আয়াতে পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠানোর যে কথা বলা হয়েছে, এখানে শুধু আদম আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য নন; বরং কেয়ামত পর্যন্ত আদম আলাইহিস সালামের সকল বংশধর উদ্দেশ্য, যারা আদম আলাইহিস সালামের মতো আল্লাহ তায়ালার খলিফা হয়ে (খেলাফত-ব্যবস্থার মাধ্যমে) পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম, আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করবে, ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। বিস্তারিত : তাফসিরে তাবারি- ১/৪৭৮-৪৭৯; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২১৬

^২ কোরআনুল কারিমের সূরা বাকারার : ৩০; সূরা স-দ : ২৬; সূরা নূর : ৫৫ ইত্যাদি আয়াতের আলোকে স্পষ্ট যে, খেলাফত দীনের একটি বড় রুকন ও ইসলামের মহান বিধান। পৃথিবীতে একজন খলিফা নির্ধারণ করা বা খেলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা (যাতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান ও শরিয়ত বাস্তবায়ন করা যায়) ওয়াজিব। বিস্তারিত : তাফসিরে কুরতুবি : ১/২৬৪-২৬৯; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২২১-২২৩

^৩ সূরা বাকারার ৪০নং আয়াত থেকে ধারাবাহিক কয়েকটি পর্বে বনি ইসরাইলের আলোচনা করা হচ্ছে। আয়াতে বনি ইসরাইল বলে মূলত মদিনার ইহুদিদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৪১

খোলাসাতুল কোরআন

তারা মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে মিসর থেকে হিজরত করেছিল। ফেরাউন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল; কিন্তু বনি ইসরাইলের জন্য সমুদ্রের উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, আর তাদের সামনেই অত্যাচারী ফেরাউনকে লোক-লশকরসুদূর ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সিনাই (তিহ) মরুভূমিতে যখন তারা সহায়-সম্বলহীন ছিল তখন তাদের আহ্বারের জন্য মাঝা ও সালওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছায়ার জন্য শীতল মেঘের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পান করার জন্য তাদের পানির প্রয়োজন ছিল, তাই পাথর থেকে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে, তারা এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেনি; বরং ক্রমেই নেয়ামত অস্বীকারের গুনাহে মত্ত হয়েছিল। তারা সত্য গোপন করেছে। গোবৎসকে ইলাহ বানিয়েছে, সিনাই (তিহ) মরুভূমিতে তারা অকৃতজ্ঞতা এবং লোভ-লালসায় ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। বিনয়ের সাথে প্রবেশের হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও তারা আরিহা^১ শহরে দম্ভভরে প্রবেশ করেছে। তারা নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে। তারা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর কালামে বিকৃতি করেছে। শরিয়তের কিছু বিধানের উপর ঈমান এনেছে আর কিছু অস্বীকার করেছে। তারা ছিল হিংসা-বিদ্বেষের ব্যাধিতে আক্রান্ত। পার্থিব জীবনের প্রতি ছিল তাদের সীমাহীন আকর্ষণ। নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের প্রতি তারা বিরক্ত ছিল।

তারা জাদু-টোনার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। তারা এমন এমন বিদ্যা-মন্ত্র জানত, যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ ঘটাতে পারত। আর এতে অবৈধ প্রেম-প্রীতির রাস্তা খুলে যেত।

জান্নাত লাভের হাস্যকর আশা

এত পাপাচার সত্ত্বেও তারা নিজেদের মনে করত জান্নাতের একমাত্র ঠিকাদার। তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলত, জান্নাতে শুধু তারাই যাবে, যারা ইহুদি হবে। খ্রিষ্টানরাও অনুরূপ দাবি করত। উভয় দলই দাবি করত যে, আমরাই সত্যের উপর আছি এবং আমাদের বিপরীত লোকদের নিকট কোনো দলিল-প্রমাণ নেই (ভেবে দেখা দরকার বনি ইসরাইলের এসব বদ-অভ্যাসের কোনোটি আমাদের মধ্যে আছে কি না)।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরীক্ষা ও দোয়া

ইহুদিদের নেয়ামত প্রদান এবং তাদের সেসব নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার বিস্তার আলোচনার পর হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়েছে, যার মহান ব্যক্তিত্বের বিষয়টি ইহুদি-খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করে থাকে।

^১ সূরা বাকারার ৫৮নং আয়াতে ও পুরো কোরআনে এর অনুরূপ আয়াতে, ‘কারইয়া’ দ্বারা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী বাইতুল মাকদিসই উদ্দেশ্য, আরিহা নয়। তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৭৩

বরং গর্বের সাথে তারা নিজেদেরকে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে থাকে। অথচ এই দাবিতে সত্যবাদী হলে অবশ্যই তারা আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করত।

আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে বিভিন্ন প্রকার বিপদ ও পরীক্ষায় নিপতিত করেছিলেন। আর তিনি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিলেন।^১ মূর্তিপূজার কারণে পিতার প্রতি অসন্তুষ্টি, নিজ সম্প্রদায়ের সাথে দ্বন্দ্ব, নমরুদের সাথে সংলাপ, আগুনে নিক্ষেপ, মাতৃভূমি থেকে হিজরত, পানি ও তরুলতাহীন বিজন মরুভূমিতে স্ত্রী-সন্তানকে রেখে আসা, প্রাণপ্রিয় সন্তানকে নিজ হাতে কোরবান করতে উদ্যোগী হওয়া—সকল ক্ষেত্রেই তিনি দৃঢ় ও অবিচল ছিলেন।^২ কোথাও সামান্য বিচ্যুতি ঘটেনি। এ দৃঢ়তার কারণেই তার দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা এক নিরাপদ শহরে পরিণত হয়েছে এবং এর অধিবাসীদের দান করা হয়েছে ফল-ফলাদির রিজিক।

হজরত ইবরাহিম আলাইহি সালামের সবচেয়ে বড় দোয়াটিও কবুল করা হয়েছে,^৩ যার কারণে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা কুরাইশ বংশে পাঠিয়েছেন।

মিল্লাতে ইবরাহিমি থেকে যারা বিমুখতা অবলম্বন করবে

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উত্তম বিষয়াদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, মিল্লাতে ইবরাহিমি থেকে শুধু সেই ব্যক্তি বিমুখ হতে পারে, যে দুর্ভাগা, বোকা ও প্রবৃত্তির গোলাম।

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা নিজেদের ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রতি সম্পৃক্ত করত। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, হানাফিয়াত অনুসরণের মধ্যে কোনো মুক্তি নেই; বরং কেবল ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টবাদ অনুসরণের মধ্যেই মুক্তি। আল্লাহ তায়ালা নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি তাদের হানাফিয়াত তথা ইসলামের দিকে দাওয়াত দিন, যা ছিল সকল নবীর ধর্ম। যদি তারা আপনার দাওয়াত কবুল করে তা হলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে আর যদি প্রত্যাখ্যান করে তা হলে সেটা হবে জেদ ও হঠকারিতাবশত ভিত্তিহীন, ভ্রান্ত অবস্থান। আপনি তাদের এই হঠকারিতার কোনো পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের বিচার করবেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যদি সেভাবে ঈমান আনে তা হলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে। আর যদি তারা বিমুখ

^১ সূরা বাকারার ১২৪নং ও সূরা নাজম-এর ৩৭নং আয়াতে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

^২ তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৪০৭

^৩ সূরা বাকারার ১২৯নং আয়াতে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দোয়াটি উল্লেখ হয়েছে।

খোলাসাতুল কোরআন

হয়ে রয় তা হলে এ কারণে আশ্চর্য হবেন না। কেননা হঠকারিতাই তাদের অভ্যাস।
যদি তারা অনিশ্চয়ের প্রয়াস চালায় তা হলে শীঘ্রই আল্লাহ তাদের বিচার করবেন।
তিনি উত্তম শ্রবণকারী এবং সর্বজ্ঞাত।' (১৩৭)